তারিখ 08 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৫

যুগান্তর

বিভুরঞ্জন সরকার

শিক্ষা ব্যবস্থা : ঢালাও হল না, সাজানোও হল না

সম্প্রতি একটি দৈনিকের উপসম্পাদকীয় কলামে এজেডএম আবদুল আলীর 'একটি শিক্ষিত জাতি হয়ে ওঠার স্বপ্ন' শিরোনামে একটি লেখা পড়েছি। আবদুল আলী সাহেব একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। ইদানীং বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করছেন। দৈনিক যুগান্তরেও 'দুই শিক্ষকের কাহিনী' শিরোনামে ৫ এপ্রিল তার একটি লেখা ছাপা হয়েছে। তার লেখা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ি, তার লেখা আমাকে আকর্ষণ করে বিষয়বস্তু এবং যুক্তিপূর্ণ গাঁথুনির কারণে। যে বিষয় নিয়েই তিনি লেখেন, তা পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার একটি বিশেষ মুন্সিয়ানা তার আছে। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার যে বিস্তৃত এবং তিনি যে এখনও প্রচুর পড়াশোনা করেন তা তার যে কোন লেখা পড়লেই বোঝা যায়। 'একটি শিক্ষিত জাতি হয়ে ওঠার স্বপ্ন' শীর্ষক ছোট লেখাটিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট নিয়ে তিনি তার উদ্বেগ তুলে ধরেছেন। প্রথমে শিক্ষার একটি সহজবোধ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন একজন বিদেশী মনীষীকে উদ্ধৃত করে। সংজ্ঞাটি হল : 'শিক্ষিত মানুষকে সহজে নেতৃত্ব দেয়া যায় কিন্তু তাড়িয়ে নেয়া যায় না, সহজে শাসন করা যায় কিন্তু দাসত্বের শৃঙ্খল পরানো যায় না।' অথচ আমাদের দেশের শিক্ষা যে জাতিকে সে হিসেবে গড়ে তুলতে পারছে না, আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যে পুরনো ঐতিহ্য ও সুনাম ধরে রাখতে পারছে না, সেজন্য আবদুল আলী সাহেব ব্যথিত হয়েছেন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে একসময় নামকরা অধ্যাপকরা শিক্ষাদান করেছেন, এখনকার ছাত্ররাও পরবর্তী জীবনে অনেক সুনামের অধিকারী হয়েছেন- সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এমন কিছু কিছু শিক্ষক আজ সেখানে ছাত্রদের পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন, তাদের কাছ থেকে ছাত্ররা আলোর বদলে অন্ধকারই পাচ্ছে বেশি।' চারদিকেই তো অন্ধকার। আলো আর কোথায়? আবদুল আলী সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, দেশের একটি প্রধান সমস্যা সম্পর্কে তিনি কিছুটা আলোকপাত করেছেন। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ না থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু আমার তো মনে হয়, সংকট শুধু আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়, সংকটের শেকড় বিস্তৃত হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়েই। দেশের প্রাথমিক শিক্ষার কি হাল, বিশেষত মফস্বলের স্কুলগুলোতে কেমন পড়াশোনা হয়, সরেজমিন গিয়ে কেউ যদি তা দেখেন তাহলে তিনি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন। বলা হয়ে থাকে, প্রাথমিক শিক্ষাই হল শিক্ষার প্রকৃত বুনিয়াদ। ভিত্তি দুর্বল হলে ইমারত মজবুত হয় না। অথচ আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে, এটা যেন পরিত্যক্ত ঘোষিত কোন বিষয়। এটা দেখাশোনার কেউ নেই। একটি কাঠামো বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কঠিন বা সময়সাপেক্ষ কিন্তু তা ধ্বংস করে দেয়া যায় দ্রুত। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেও একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরিবর্তে প্রায় ধ্বংস করে নিচ্ছি, কার্যত ধ্বংস করছি আমাদের ভবিষ্যৎকেই। অথচ এ ব্যাপারে আমাদের রাজনীতিবিদ বা সমাজপতিদের কোন উদ্বেগ আছে বলে মনে হয় না। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের স্কুলে লেখাপড়া করে অনেকেই কৃতবিদ্যা হয়েছেন- এমন ভূরি ভূরি নজির এক সময় দেয়া যেত। কিন্তু আজ সে অবস্থা নেই। গোবরে আজ আর সেভাবে পদ্মফুল ফুটছে না। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' বলে আমরা আপ্তবাক্য উচ্চারণ করি ঠিকই কিন্তু জাতির সেই মেরুদণ্ড যে একেবারেই ভেঙে পড়ছে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে, সেদিকে আমাদের কারও নজর নেই। দেশের জটিলতাকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নামকরা স্কুল-কলেজের / আওতাভুক্ত থেকে বাদ রাখা হচ্ছে। ওগুলো দেখে, মনে হবে গোটা দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। শহরাঞ্চলের বাইরে দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শিক্ষার নামে আসলে যে কিছুই শিখছে না, আধুনিক দুনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠার মতো কোন বিদ্যাশই যে তাদের ঘটছে না, তা কি আমাদের কোন রাজনৈতিক দলের বিবেচনায় আছে? কারও বক্তৃতা-বিবৃতিতে তো এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় না।

শিক্ষা নাকি মানুষের মনোজগৎকে আলোকিত করে। অজ্ঞানতাকে জানার জন্য জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী করে তোলে। একজন অন্ধ মানুষ আর একজন নিরক্ষর মানুষের মধ্যে নাকি কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি সাধারণভাবে আলোকিত মানুষ তৈরির কোন ব্যবস্থা সত্যি আছে? নাকি গ্রামাঞ্চলে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া শেখার নামে শ্রমবিমুখ, জ্ঞানবিমুখ এবং কলহপ্রিয় মানুষ হিসেবেই গড়ে উঠছে। গ্রামে গেলেই প্রবীণদের আফসোস করে বলতে শোনা যায়, আজকাল ভাল শিক্ষকের বড়ই অভাব। ভাল শিক্ষক যদি না পাওয়া যায়, ভাল ছাত্র তৈরি হবে কিভাবে? মাস্টার সাহেব ভোঁতা হলে ছাত্রছাত্রীরা উজ্জ্বল হয় কি করে? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উপাচার্য বা শিক্ষকদের নৈতিকতায় স্খলন, ক্ষুদ্রতা, দলবাজি, ক্লাসরুমে পাঠদানে অনীহার 'খবর' মাঝেমধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় কিছুটা হয়তো আমরা জানছি। সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য বা শিক্ষকদের সম্পর্কে সুনামহানির নানা কেচ্ছাকাহিনী সংবাদপত্রে যখন প্রকাশ পায়, সংশ্লিষ্টরা সম্ভবত লজ্জাবোধ করার পরিবর্তে গৌরববোধ করেন, কাগজে নাম ছাপা হয়েছে এই ভেবে! সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষকই যদি এমন মনোবিকারগ্রস্ত হতে পারেন, তাহলে নিচের দিকের অবস্থা কল্পনা করতে কি খুব কষ্ট হয়? দেশজুড়ে যে হাজার হাজার সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেগুলোতে কি হচ্ছে, শিক্ষকদের গুণগত মান কেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার সঙ্গেই বা কারা জড়িত আছেন বা হচ্ছেন- এসব খবর আমরা রাখি না। দেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি, এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নিয়ে সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদির আয়োজন করি। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রের সংকট নিয়ে আমাদের তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। যেন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এত এগিয়ে আছি যে, এ নিয়ে আর কোন আলোচনার দরকার নেই।

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবিতে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোকে যথেষ্ট তৎপর থাকতে দেখেছি। কিন্তু আজকাল ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রদের সমস্যা বা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে মোটেও চিন্তিত বলে মনে হয় না, তারা রাজনৈতিক দলের হুকুমবরদারে পরিণত হয়েছে। আমার ছাত্রজীবন থেকেই শুনে আসছি যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে না পারলে আমরা আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগুতে পারব না। মনে আছে, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে শিক্ষা সংস্কার নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয়েছিল। আলোচকদের মধ্যে যেমন ছাত্র নেতারাও ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। অনেকেই সেই সভায় বলেছিলেন, দ্রুত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে, না হলে আমাদের সমগ্র জাতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। ওই আলোচনা সভাতেই প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেছিলেন, আপনারা শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কথা বলেছেন, কিন্তু প্রশ্নটা হল- ঢালবে কে, আর সাজাবে কে? শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উপযুক্ত লোকের অভাবের কথাই সম্ভবত তিনি বুঝিয়েছিলেন।

তারপরও মোটামুটি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজনীতিতে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। দেশের রাজনীতি যেমন ক্রমাগত পশ্চাৎমুখী হয়েছে, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নেমেছে ধস। রাজনীতিতে যেমন শ্রদ্ধা করার মতো, অনুকরণ করার মতো আদর্শবান নেতা পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে, শিক্ষা ক্ষেত্রেও তেমনি এমন শিক্ষকদের নামের তালিকা খুব দীর্ঘ হবে না, যাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মাথা নুইয়ে আসে। সেদিন এক গোলটেবিল বৈঠকে একজন আলোচক আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, আমাদের দেশে ২০ জন লোকও এখন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, যারা সব রকমের বিতর্কের ঊর্ধ্বে, যাদের প্রতি সবাই সম্মান জানাতে প্রস্তুত। জাতি হিসেবে এটা কি আমাদের জন্য খুব গৌরবের?

স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৫ বছরে এই তাহলে আমাদের অর্জন? আমাদের সামনে কোন হিরো নেই, আমাদের সামনে কোন আদর্শ মডেল নেই। আমাদের রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য পরস্পর যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে উত্তেজক বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। কিন্তু এই নেতাদের প্রতি কি দেশের তরুণ প্রজন্মের কোন শ্রদ্ধা বা সম্মান আছে? আমাদের দেশের কোন ছাত্রীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ভবিষ্যতে তুমি কার মতো হতে চাও, তাহলে কেউ কি বলবে, আমি খালেদা জিয়ার মতো হতে চাই অথবা আমি শেখ হাসিনার মতো হতে চাই? কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলে কী বলবে যে আমি অমুক নেতার মতো ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক হতে চাই? যদি না বলে, তাহলে কিসের জন্য আমরা এত ঝগড়া-বিবাদ করছি। রাজনীতির নামে হিংসার যে পথ আমাদের সামনে তৈরি করে দেয়া হচ্ছে তা যে আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা কি আমরা বুঝতে পারছি? আমাদের রাজনীতি আমাদের শিক্ষাকে শৃঙ্খলিত করেছে আর আমাদের শিক্ষা আমাদের সামনে জ্ঞানের আলো না জ্বালিয়ে যুক্তিরহিত মানুষ তৈরি করছে। দেশের যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা অসংখ্য মাদ্রাসা দেশের ভেতর অন্ধকার বিস্তারে কি রকম ভয়াবহ ভূমিকা পালন করছে, সেটা জোর দিয়ে বলার মতো নৈতিক শক্তিও আমাদের অনেকেই হারিয়ে ফেলেছেন। মুখে আধুনিকতার কথা বলেন, উন্নত বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাহিনীও বলেন, আর নিজে সুযোগ পেলেই বিজ্ঞানভিত্তিক ও কর্মমুখী আধুনিক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বদলে গ্রামের বাড়ি গিয়ে একটি মাদ্রাসা বানানোর জন্য টাকা দিয়ে দোআহানের নেকি হাসিল করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা যে ধর্মীয় শিক্ষার নামে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে এক ধরনের যুক্তিবুদ্ধিহীন উন্মাদে পরিণত করছে, তারা বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার যোগ্য না হয়ে 'জেহাদ' করার খোয়াব নিয়ে মানবিকতাহীন হিংস্র মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে উঠছে। আমাদের অনেকেই হয়তো মনে করছেন, এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করার আমি কে? যারা রাজনীতি করেন, দেশ দশ নিয়ে ভাবেন, তারাই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সংকট-বৈষম্য নিয়ে ভাবুক, এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে দেশে যে নানা ধরনের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে তা দূর করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ তারাই নিক।

এই দায় এড়ানোর মনোভাবটা খুবই ক্ষতিকর। পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে প্রতিবেশী যেমন নিরাপদ বোধ করতে পারে না, তেমনি দেশের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারটাও কেবল গুটিকয় রাজনীতিবিদের হাতে ছেড়ে দেয়াও ঠিক না। বেশির ভাগ রাজনীতিক দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্য বলে পরিচিত করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজনীতিবিদদের দূরদৃষ্টির অভাব রয়েছে, অভাব রয়েছে দায়িত্ববোধেরও। কথার মারপ্যাঁচে তারা মানুষকে পক্ষে টানার চেষ্টা করেন। এ ধরনের কৌশল দেশের অগ্রযাত্রায় কোন ফল দেয় না। রাজনীতির বিবাদ-বিসম্বাদ দেশকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে তা আমরা প্রতিদিনই অনুভব করছি। ফলে রাজনীতিবিদদের ওপর সব ব্যাপারে ভরসা করে বসে থাকলে পস্তাতে হবে। এটা অবশ্য মানতেই হবে যে, রাজনীতিবিদদেরই প্রধান দায়িত্ব জাতিকে পথ দেখানোর, নেতৃত্ব দেয়ার। কিন্তু সেক্ষেত্রে যখন ঘাটতি দেখা দেয়, তখন নাগরিক সমাজেরই দায়িত্ব হয়ে পড়ে এগিয়ে আসার। রাজনীতির চাকাটাকে সঠিক লাইনে তুলে দিতে না পারলে তো দেশের সব সম্ভাবনাই পোকায় খেয়ে নেবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন কথা প্রসঙ্গে দিনুবাবুকে (রবীন্দ্রনাথের নাতি দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর) বলেছিলেন, বুঝলি দিনু, সেদিন অমুক লোকটা আমার কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলল, আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলুম।

দিনুবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, তুমি দিলে ওকে টাকাটা? ও তো একটা জোচ্চোর!

রবীন্দ্রনাথ শান্ত স্বরে বললেন, তা মানি। কিন্তু লোকটার শত দোষ থাকলেও একটা গুণ ছিল। লোকটা সত্যভাষী : কথা রেখেছিল- আমার কাছে চিরঋণী হয়েই রইল।

আমাদের বর্তমান সরকার উন্নয়নের গালভরা বুলি এনিয়ে দেশবাসীকে শুধু চিরঋণী করেই রাখছে। অন্য সব ক্ষেত্র বাদ দিয়ে কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রের একদরমহাল একটু ভালভাবে চোখ বুলালেই বোঝা হয়, কাগজে থেকে কিছুটা ছিটেফোঁটা দেখানোর চেষ্টা করলেও ভেতরে আসলে সদরঘাট। অহংকার করার কিছুই নেই।

বিভুরঞ্জন সরকার : সাংবাদিক

তারপরও মোটামুটি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজনীতিতে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। দেশের রাজনীতি যেমন ক্রমাগত পশ্চাৎমুখী হয়েছে, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নেমেছে ধস। রাজনীতিতে যেমন শ্রদ্ধা করার মতো, অনুকরণ করার মতো আদর্শবান নেতা পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে, শিক্ষা ক্ষেত্রেও তেমনি এমন শিক্ষকদের নামের তালিকা খুব দীর্ঘ হবে না, যাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মাথা নুইয়ে আসে। সেদিন এক গোলটেবিল বৈঠকে একজন আলোচক আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন, আমাদের দেশে ২০ জন লোকও এখন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, যারা সব রকমের বিতর্কের ঊর্ধ্বে, যাদের প্রতি সবাই সম্মান জানাতে প্রস্তুত। জাতি হিসেবে এটা কি আমাদের জন্য খুব গৌরবের?